ইউনিট ২
ভাইরাসজনিত
রোগ

ইউনিট ২ ভাইরাসজনিত রোগ

গৃহপালিত পাখির জীবাণুঘটিত রোগগুলোর মধ্যে ভাইরাসজনিত রোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভাইরাসজনিত রোগের জন্য এ পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি। ভাইরাস আমিষ ও নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের অতি অণুবীক্ষণিক বস্তু যা শুধু পোষকের দেহাভ্যন্তরে বংশবিস্তার করতে সক্ষম। পোষকের দেহের বাইরে সাধারণত এর কোনো প্রাণের অস্তিত্ব থাকে না। বেশিরভাগ ভাইরাসই ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। অথচ, এ ক্ষুদ্র জীবাণুগুলো মানুষসহ গবাদিপশু, পাখি ও বন্যপ্রাণীর, এমনকী উদ্ভিদের, মারাত্তক মারাত্তক রোগের জন্য দায়ী। গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রির অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্তক রোগের কারণ এ অতিক্ষুদ্র ভাইরাস। পোল্ট্রির বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগের মধ্যে রাণীক্ষেত, বসন্ত, গামবোরো, মারেক'স, এগ ড্রপ সিন্ড্রোম, ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস, ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াইটিস, ডাক প্লেগ, ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস ইত্যাদি প্রধান। এদের আক্রমণে প্রতি বছর বাংলাদেশে বহুসংখ্যক পোল্ট্রি মারা যায়। আর যেগুলো বেঁচে থাকে সেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়। অনেক সময় এরা রোগের বাহক হিসেবেও কাজ করে। ফলে খামারী তথা দেশের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়। যেহেতু ভাইরাসজনিত রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, তাই আগে থেকে খামারে বা বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থায় পোল্ট্রি পালন করতে হবে এবং এদেরকে নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা প্রদান করতে হবে। সঠিকভাবে রোগপ্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারলেই খামারে বা পোল্ট্রি পালন এলাকায় ভাইরাসজনিত রোগ দমন করা যাবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গৃহপালিত পাখির বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগ, যেমন– রাণীক্ষেত, বসন্ত, গামবোরো, মারেক'স, ডাক প্লেগ প্রভৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ রাণীক্ষেত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- রাণীক্ষেত রোগের উৎপত্তি, কারণ ও সংক্রমণ বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত পাখি শণাক্ত করতে পারবেন।
- রাণীক্ষেত রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

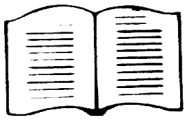

বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে ছোঁয়াচে, মারাত্তক ও গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাসজনিত রোগ। এতে শ্বাসনালি, অন্তনালি ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়।

রাণীক্ষেত মুরগির ভাইরাসজনিত তীব্র ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর কমবেশি প্রত্যেক দেশে এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্তক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ রোগের ব্যাপকতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, মুরগি পালনের জন্য রাণীক্ষেত রোগ একটি প্রধান অন্তরায়। বয়স্ক অপেক্ষা বাচ্চা মুরগি এতে বেশি মারাত্তকভাবে আক্রান্ত হয়। সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়ায়, যেমন– শীত ও বসন্ত কালে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। তবে, বছরের অন্যান্য সময়েও এ রোগ হতে পারে। এ রোগটি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক শহরে শণাক্ত করা হয়। তাই একে নিউক্যাসল ডিজিজ (Newcastle Disease) বলা হয়। তাছাড়া এ উপমহাদেশে ভারতের রাণীক্ষেত নামক স্থানে সর্বপ্রথম এ রোগটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে বলে একে রাণীক্ষেত রোগ বলা হয়। এ রোগে মুরগির শ্বাসনালি, অন্তনালি ও স্নায়ুতন্ত আক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই এ রোগকে অ্যাভিয়ান নিউমো-এনসেফালাইটিস (Avian Pneumo-encephalitis) নামেও ডাকা হয়।

রোগের কারণ

প্যারামিক্সোভিরিডি (Paramixoviridae) পরিবারের নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাস (Newcastle Disease Virus) নামক এক প্রজাতির প্যারামিক্সোভাইরাস এ রোগের কারণ।

রোগ সংক্রমণ

বাতাস, অসুস্থ পাখির সর্দি, কাশি, বন্য পশু, খাদ্য, পানি, লিটার, পরিচর্যাকারির জামা-জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে রাণীক্ষেত রোগ ছড়ায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

- বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত স্থান থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।
- অসুস্থ বা বাহক পাখির সর্দি, কাশি, হাঁচি থেকে সুস্থ পাখিতে এ রোগজীবাণু ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত এবং অতিথি পাখি আমদানির মাধ্যমে।
- মৃত মুরগি বা পাখি যেখানে সেখানে ফেললে।
- বন্য পশুপাখির মাধ্যমে।
- পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থী মানুষের জামা, জুতো বা খামারের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ

রাণীক্ষেত রোগ পাখিতে তিন প্রকৃতিতে দেখা যায়। যথা– ভেলোজেনিক, মেসোজেনিক ও লেন্টোজেনিক।

এ রোগে প্রধানত শ্বাসতন্ত্র , স্নায়ুতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। এতে তিন প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

ক. ভেলোজেনিক প্রকৃতি (Velogenic Form) ঃ এ প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগ সবচেয়ে মারাত্মক। এতে অনেক সময় অত্যন্ত দ্রুত জীবাণু সংক্রমণের ফলে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মুরগি মারা যেতে পারে। তবে তা না হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। যেমন–

- প্রথমদিকে আক্রান্ত পাখি দলছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে।
- মাথায় কাপুনি হয়, ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করে।
- সাদাটে সবুজ পাতলা পায়খানা করে ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- মুখ হা করে রাখে, কাশতে থাকে এবং নাকমুখ দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
- শরীর শুকিয়ে যায়।
- মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল কালচে হয় এবং চোখমুখ ফুলে যায়।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়, ডিমের খোসা পাতলা ও খসখসে হয়। তাছাড়া অপুষ্ট ডিম উৎপন্ন হয়।

ক– আক্রান্ত মুরগি খ– আক্রান্ত মুরগির ডিম

চিত্র ৬ (ক, খ) ঃ রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগি ও মুরগির ডিম

খ. মেসোজেনিক প্রকৃতি (Mesogenic Form) ঃ এ প্রকৃতিতে আক্রান্ত মুরগিতে রোগলক্ষণ ততটা তীব্র নয়। তবে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- পাখির কাশি হয় ও মুখ হা করে নিঃশ্বাস নেয়।
- হলদে সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে।
- জীবাণু আক্রমণের দুসপ্তাহ পর স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। ফলে মাথা ঘোরায় ও পা অবশ হয়ে যায়।
- মাথা একপাশে বেঁকে যেতে পারে, কখনো বা মাথা দুপায়ের মাঝখানে চলে আসে অথবা সোজা ঘাড় বরাবর পিছন দিকে বেঁকে যেতে পারে।

চিত্র ৭ ঃ রাণীক্ষেত রোগে মুরগির ঘাড় বেঁকে যায়

গ. লেন্টোজেনিক প্রকৃতি (Lentogenic Form) ঃ এতে মৃদু প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

- শ্বাসতন্ত্র কম আক্রান্ত হওয়ায় এ তন্ত্রের লক্ষণ কম প্রকাশ পায়।
- সামান্য কাশি থাকে।
- কিছুটা ক্ষুধামন্দা ভাব থাকে।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, ভাইরাস পৃথকীকরণ, ময়না তদন্তে বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে রাণীক্ষেত রোগ নির্ণয় করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে রাণীক্ষেত রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ থেকে।
- ভাইরাস পৃথকীকরণ ও শণাক্তকরণের মাধ্যমে।
- শ্বাসনালির নিঃস্রাব, পাখির রক্ত, অস্থিমজ্জা, মস্তিষ্ক, প্লীহা, ফুসফুস প্রভৃতি গবেষণাগারে পরীক্ষা করে।
- মৃত মুরগির ময়না তদন্তের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের রোগতাত্ত্বিক বা প্যাথলজিক্যাল (Pathological Changes) পরিবর্তন দেখে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো দেখা যায়। যথা–

- শ্বাসনালিতে রক্তাধিক্য ও রক্ত সঞ্চায়ন।
- স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালিতে রক্তাম্বু বা শ্লৈষ্মিক নিঃস্রাব।
- প্লীহা বড় হয়ে যায়।
- খাদ্য অন্ত্রে, বিশেষ করে প্রোভেন্ট্রিকুলাস ও গিজার্ডে রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত (Haemorrhagic Necrotic Foci)।
- অন্ত্রের শেষভাগে পাতলা সাদাটে মল।

চিত্র ৮ ঃ প্রোভেন্ট্রিকুলাস ও গিজার্ডে রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত

চিকিৎসা

রানীক্ষেত রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, আক্রান্ত পাখিতে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ রোধে অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইডজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও ০.০১% পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানির সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত পাখিকে দৈনিক ২/৩ বার খাওয়ানো যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ

রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধের জন্য এদেশে দুধরনের টিকা তৈরি হয়। যথা– বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি.। এছাড়াও বিদেশ থেকে টিকা আমদানি করা হয়।

প্রতিরোধই এ রোগ দূরীকরণের একমাত্র উপায়। তাই সময়মতো পাখিদের টিকাদান করতে হবে। বাংলাদেশে রাণীক্ষেত রোগের দুধরনের টিকা প্রস্তুত হয়। যথা– বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি.।

বি.সি.আর.ডি.ভি (BCRDV– Baby Chick Ranikhet Disease Vaccরহব) ঃ এ টিকাবীজের প্রতিটি শিশি বা ভায়ালে (Vial) হিম শুষ্ক অবস্থায় ১ মি.লি. মূল টিকাবীজ থাকে। প্রতিটি শিশির টিকাবীজ ৬ মি.লি. পরিস্রুত পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হয়। এরপর ৭ দিন ও ২১ দিন বয়সের প্রতিটি বাচ্চা মুরগির এক চোখে এক ফোটা করে ড্রপারের সাহায্যে দিতে হয়। প্রতিটি সবুজ রঙের শিশিতে ১০০ মাত্রার টিকা থাকে।

আর.ডি.ভি. (RDV– Ranikhet Disease Vaccine) ঃ এ টিকাবীজের প্রতিটি ভায়ালে ০.৩ মি.লি. মূল টিকাবীজ হিম শুষ্ক অবস্থায় থাকে। এ টিকা দুমাসের অধিক বয়সের মুরগির জন্য উপযোগী। প্রথমে ভায়ালের টিকাবীজ ১০০ মি.লি. পরিস্রুত পানির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর তা থেকে ১ মি.লি. করে নিয়ে প্রতিটি মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। ছয় মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি সাদা রঙের শিশিতে ১০০ মাত্রার টিকাবীজ থাকে। এছাড়াও বিদেশ থেকে রাণীক্ষেত রোগের বিভিন্ন টিকা আমদানি করা হয়। যেমন– নবিলিস এন ডি ক্লোন ৩০, নবিলিস এন ডি ল্যাসোটা, নবিলিস এন ডি হিচনার (ইন্টারভেট)। এগুলো কোম্পানির নির্দেশমতো প্রয়োগ করতে হবে।

টিকা ছাড়াও খামার থেকে এ রোগ দমনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা–

- রাণীক্ষেত রোগে মৃত পাখিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটিচাপা দিতে হবে।
- খামারের যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন– আয়োসান, সুপারসেপ্ট ইত্যাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায়) দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *আপনার মতে কোনো খামারে রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত? যুক্তিসহ লিখুন।*

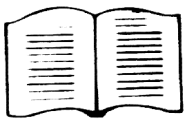

সারমর্ম ঃ রাণীক্ষেত রোগ বা নিউক্যাসল ডিজিজ মুরগির ভাইরাসজনিত একটি তীব্র প্রকৃতির ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর সবদেশেই এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্তক। এ রোগে মুরগির শ্বাসনালি, অন্তনালি ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। এ রোগে পাখিতে তিন প্রকৃতির রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা– ভেলোজেনিক, মেসোজেনিক ও লেন্টোজেনিক প্রকৃতি। এ রোগের তেমন কোনো চিকিৎসা নেই। কাজেই প্রতিরোধই রোগ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পথ। এ রোগ প্রতিরোধে বাংলাদেশে দুধরনের টিকাবীজ তৈরি হয়। যথা– বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি.। এছাড়াও বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের রাণীক্ষেত টিকা আমদানি করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. রাণীক্ষেত রোগ সর্বপ্রথম কোথায় শণাক্ত করা হয়?

i) বাংলাদেশের সাভারে
ii) ইংল্যান্ডের নিউক্যাসলে
iii) ভারতের রাণীক্ষেতে
iv) পাকিস্তানের লাহোরে

খ. রাণীক্ষেত রোগে মুরগির কোন্ কোন্ তন্ত্র আক্রান্ত হয়?

i) শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র
ii) শ্বাসতন্ত্র , পরিপাকতন্ত্র ও জননতন্ত্র
iii) শ্বাসতন্ত্র, জননতন্ত্র ও মূত্রতন্ত্র
রা) শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তসংবহনতন্ত্র

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. রাণীক্ষেত রোগ একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।
খ. রাণীক্ষেত রোগ খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. রাণীক্ষেত রোগকে অ্যাভিয়ান _____ নামেও ডাকা হয়।
খ. ভেলোজেনিক প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগে মুরগি _____ সবুজ পাতলা পায়খানা করে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বিভিন্ন প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগের নাম লিখুন।
খ. বাংলাদেশে তৈরি রাণীক্ষেত রোগের টিকাগুলোর নাম লিখুন।

পাঠ ২.২ বসন্ত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পাখির বসন্ত রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- বসন্তের কারণ ও সংক্রমণ লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকৃতির বসন্তের নাম লিখতে পারবেন ও এগুলোর লক্ষণ আলোচনা করতে পারবেন।
- বসন্ত রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।

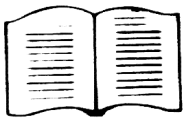

পাখির বসন্ত ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স ও প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে।

পাখির বসন্ত বা ফাউল পক্স (Fowl Pox) একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়সের ও সব প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। পাখির বসন্ত একটি মারাত্তক রোগ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এ রোগের সঙ্গে পরিচিত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকতা লাভ করে। তখন মৃত্যু হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। যদিও ফাউল পক্স বলতে সব পাখির বসন্ত রোগকেই বুঝায় তথাপি বর্তমানে আলাদা নামেও, যেমন– পিজিয়ন পক্স, টার্কি পক্স, ক্যানারি পক্স প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব পোল্ট্রি উৎপাদনকারী দেশেই বসন্ত রোগ দেখা যায়। এ রোগে পাখির দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত উন্মুক্ত স্থানে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালচে নডিউল (Nodule) সৃষ্টি হয় যা বসন্তের গুটি নামে পরিচিত।

রোগের কারণ

পক্সভিরিডি (Poxviridae) পরিবারের ফাউল পক্স ভাইরাস (Fowl Pox Virus) নামক ভাইরাস বসন্ত রোগের কারণ।

সংক্রমণ

রোগাক্রান্ত পাখির সংস্পর্শ, ত্বকের ক্ষত, *Culex* ও *Aedes* মশা এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের কামড়ের মাধ্যমে বসন্ত রোগ সংক্রমিত হয়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। যথা–

- রোগাক্রান্ত পাখির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে সুস্থ পাখিতে এ রোগ ছড়াতে পারে।
- ত্বকের ক্ষত বা কাটা ছেঁড়ার মাধ্যমে।
- *Culex (কিউলেক্স)* ও *Aedes* (*অ্যাডিস*) মশা এবং দংশনকারী কীটপতঙ্গের মাধ্যমে।
- তাছাড়া কখনো কখনো রক্তশোষক মাছি, ফ্লি ও আটালির মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ

উসন্ত রোগ প্রধানত ত্বকীয় ও ডিপথেরিটিক প্রকৃতিতে দেখা যায়। এগুলো আবার মৃদু ও তীব্র আকারে রোগলক্ষণ প্রকাশ করতে পারে।

উসন্ত রোগ প্রধানত দুপ্রকৃতিতে দেখা যায়। যথা–

ক. ত্বকীয় বা হেড ফর্ম (Cutaneous or Head Form) ঃ এ প্রকৃতিতে আক্রান্ত পাখির মুখমন্ডলে বসন্তের গুটি দেখা যায়। আক্রান্ত পাখির ক্ষুধামন্দা, দৈহিক ওজন হ্রাস ও ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটিকে শুষ্ক বসন্ত ও (Dry Pox) বলা হয়।

খ. ডিপথেরিটিক প্রকৃতি (Diptheritic Form) ঃ এ প্রকৃতিতে প্রথমে আক্রান্ত পাখির জিহ্বায় ক্ষত দেখা যায়। এ ক্ষত পরে শ্বাসনালি ও ফুসফুসে বিস্তারলাভ করে। অপ্রধান জীবাণুর জটিলতায় অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণে অবশেষে পাখির মৃত্যু ঘটে। এ প্রকৃতির বসন্ত আর্দ্র বসন্ত (Wet Pox) নামেও পরিচিত।

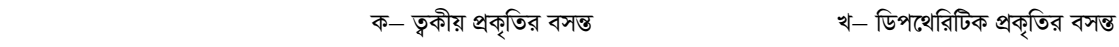

ক– ত্বকীয় প্রকৃতির বসন্ত খ– ডিপথেরিটিক প্রকৃতির বসন্ত

চিত্র ৯ (ক, খ) ঃ ত্বকীয় ও ডিপথেরিটিক প্রকৃতির বসন্তে আক্রান্ত মুরগির ক্ষত

এ দুপ্রকৃতির বসন্ত আবার পাখিতে মৃদু ও তীব্র আকারে রোগলক্ষণ প্রকাশ করতে পারে। যেমন–

মৃদু প্রকৃতির বসন্তে–

- পাখির উন্মুক্ত ত্বকে বসন্তের ফোস্কা দেখা যায়। এটিই এ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- মুরগির ঝুঁটি, গলকম্বল, পা, পায়ের আঙ্গুল ও পায়ুর চারপাশে বসন্তের গুটি বা ফুসকুঁড়ি দেখা যায়। এগুলো কিছুটা কালচে বাদামি রঙের হয়।
- চোখের চারপাশে বসন্তের ফুসকুঁড়ির ফলে চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

তীব্র প্রকৃতির বসন্তে–

- দেহের মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি ও অন্ত্রের দেয়ালেও বসন্ত্রের ক্ষত দেখা দিতে পারে।
- শ্বাসনালি আক্রান্ত্রের ফলে পাখির শ্বাসকষ্ট হয় ও পাখি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।
- এতে ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- এতে পাখির মৃত্যু হার ৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে বসন্ত রোগ নির্ণয় করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে পাখিতে বসন্ত রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- মুরগির আক্রান্ত স্থানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যায়। যথা–
  - ♦ আক্রান্ত স্থানে প্রথমে ছোট ছোট লাল দাগ হয়।
  - ♦ পরবর্তীতে যা বড় হয়ে পুঁজপূর্ণ হয় ও পেঁকে ঘা সৃষ্টি করে। এ ঘায়ে শেষে মামড়ি সৃষ্টি হয় ও তা পরবর্তীতে খসে পড়ে।
- আক্রান্ত পাখির ক্ষতের নমুনা সুস্থ পাখির ঝুঁটি বা পালকের ফলিকুলে আঁচড়িয়ে প্রবেশ করিয়ে উৎপন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুটি দেখে।

চিকিৎসা

বসন্ত রোগের কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই।

এ রোগের কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। তবে আক্রান্ত ক্ষত জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন– মারকিউরিকক্রোম) দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে সকেটিল, সালফানিলামাইড বা অন্য কোনো

জীবাণুনাশক পাউডার লাগালে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ রোধ করতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

উসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য যথাসময়ে পাখিদের টিকা প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি এবং মশা নিয়ন্ত্রণও জরুরি।

রোগপ্রতিরোধের জন্য যথাসময়ে পাখিদের টিকা প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি এবং মশা নিয়ন্ত্রণও জরুরি। রোগ থেকে আরোগ্য লাভকারী পাখিতে আজীবনের জন্য রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে। বসন্ত প্রতিরোধের জন্য এ দেশে দুধরনের টিকা প্রয়োগ করা হয়। যথা–

১. পিজিয়ন পক্স টিকা ঃ এটি ৩ মি.লি. পরিশ্রুত পানির সাথে মিশিয়ে দুসপ্তাহের বাচ্চার ডানার পালকবিহীন অংশে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল (Biforked Priking Needle) বা সুচ দিয়ে খোঁচা মেরে প্রয়োগ করা হয়।

২. ফাউল পক্স টিকা ঃ এ টিকা হিম শুষ্ক অবস্থায় ০.৩ মি.লি. মাত্রায় কাচের অ্যাম্বুলে থাকে। এ পরিমাণ টিকা পরিস্রুত পানিতে মিশিয়ে দু শ পাখিতে প্রয়োগ করা যায়। পিজিয়ন পক্স টিকার মতো এ টিকাও একই পদ্ধতিতে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল দিয়ে পাখির ডানার পালকবিহীন স্থানে ৩ বার বিদ্ধ করতে হবে। প্রতিবারই পরিস্রুত পানিতে গুলানো টিকায় নিডল চুবিয়ে নিতে হবে। এ টিকা প্রয়োগের ৫, ৭ ও ১০তম দিনে টিকাবিদ্ধ স্থানে বসন্তের গুটি দেখা গেলে এর কার্যকারিতা প্রমাণ হবে। এ টিকা একমাসের বেশি বয়সের পাখিতে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও বিদেশে প্রস্তুত বসন্ত রোগের টিকা পাওয়া যায়। যেমন– ওভোডিপথেরিন ফোর্ট (ইন্টারভেট) যা কোম্পানির নির্দেশমতো মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। বছরে একবার পাখিতে এ টিকা প্রয়োগ করা হয়।

অনুশীলন (Activity) ঃ *মুরগির রাণীক্ষেত ও বসন্তের লক্ষণগুলোর মধ্যকার পার্থক্য ছক আকারে লিখুন।*

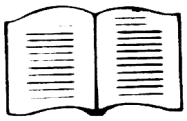

সারমর্ম ঃ পাখির বসন্ত বা ফাউল পক্স একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স ও প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে ৫০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে। এ রোগে পাখির দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে পালকবিহীন স্থানে এবং মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, অন্ত্র প্রভৃতিতে বসন্তের গুটি দেখা যায়। রোগাক্রান্ত পাখির স্পর্শে, ত্বকের ক্ষতের মাধ্যমে এবং কীটপতঙ্গ, যেমন– মশা, মাছি, ফ্লি, আটালি ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। বসন্ত রোগ ত্বকীয় ও ডিপথেরিটিক প্রকৃতির হতে পারে। এ রোগের লক্ষণ মৃদু এবং তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে পারে। ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা, মশামাছি ধ্বংস ও টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বসন্তের বিরুদ্ধে এদেশে পিজিয়ন পক্স ও ফাউল পক্স টিকা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও বাজারে বিদেশে প্রস্তুত টিকা পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্ কোন্ প্রজাতির মশার মাধ্যমে পাখির বসন্ত রোগ ছড়ায়?

i) *Culex I Anopheles*
ii) *Aedes I Anopheles*
iii) *Culex I Aedes*
iv) কোনোটিই নয়

খ. তীব্র প্রকৃতির বসন্তে কত % পর্যন্ত পাখি মারা যেতে পারে?

i) 30%
ii) 38%
iii) 45%
iv) 50%

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. শ্বাসনালি আক্রান্ত হলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পাখি মারা যেতে পারে।

খ. বসন্তের গুটি প্রথমে ছোট লাল দাগ হিসেবে আবির্ভ ত হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ প্রিকিং নিডলের মাধ্যমে বসন্তের টিকা দেয়া হয়।
খ. ফাউল পক্স টিকা থথথথথ অধিক বয়সের মুরগিতে দিতে হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বসন্ত রোগ কয় প্রকৃতির হতে পারে? নাম লিখুন।
খ. এদেশে ব্যবহৃত বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকাগুলোর নাম লিখুন।

পাঠ ২.৩ গামবোরো রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গামবোরো রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- গামবোরো রোগের কারণ, সংক্রমণ ও লক্ষণ লিখতে পারবেন।
- গামবোরো রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

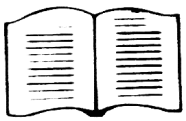

গামবোরো বাচ্চা মুরগির মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এতে পাখির রোগপ্রতিরোধক অঙ্গ আক্রান্ত হয় বলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। একে বার্ড এইডসও বলে।

গামবোরো বাচ্চা মুরগির মারাত্মক সংক্রামক রোগ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। এ রোগে পাখির রোগপ্রতিরোধক অঙ্গ অর্থাৎ বার্সা অভ্ ফ্যাব্রিসিয়াস (Bursa of Fabricius) আক্রান্ত হয় বলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন এরা সহজেই অন্য যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ রোগকে বার্ড এইডস বা পোল্ট্রি এইডসও (Bird AIDS or Poultry AIDS) বলা হয়। এ রোগটি সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের দেলওয়ার অঙ্গরাজ্যের গামবোরো জেলায় শণাক্ত করা হয় বলে একে গামবোরো রোগ বলে। কিন্তু এর মূল নাম ইনফেকশাস বার্সাইটিস (Infectious Bursitis) বা ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ (Infectious Bursal Disease)। এ রোগে সাধারণত ২–৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্তের হার খুব বেশি (১০০% পর্যন্ত), তবে মৃত্যু হার কম (৫–১৫%)। তবে, কোনো কোনো সময় আক্রান্ত বাচ্চার ৫০%ও মারা যেতে পারে। এ রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়।

রোগের কারণ

বিরনাভিরিডি (Birnaviridae) পরিবারের অন্তর্গত বিরনা ভাইরাসের সেরোটাইপ ১ এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসের দুটো স্ট্রেইন রয়েছে। যেমন– ক্ল্যাসিক্যাল (Classical) ও ভ্যারিয়্যান্ট (Varient) স্ট্রেইন।

সংক্রমণ

আক্রান্ত পাখির সংস্পর্শ, বাতাস, কলুষিত লিটার, যন্ত্রপাতি, খাদ্য, পরিচর্যাকারীর জামা-জুতো প্রভৃতির মাধ্যমে গামবোরো রোগ ছড়ায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগটি সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

- একই ঘরে রাখা অসুস্থ বাচ্চার সংস্পর্শে সুস্থ বাচ্চা এলে।
- বাতাসের মাধ্যমে।
- কলুষিত লিটার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে।
- খাদ্য এবং লিটারের পোকামাকড়ের মাধ্যমে।
- পরিচর্যাকারী বা দর্শণার্থীর জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে।

লক্ষণ

গামবোরো রোগে আক্রান্ত পাখিতে ক্ষুধামন্দা, পালক উসকোখুশকো হওয়া, সাদা ও আঠালো পাতলা পায়খানা হওয়া যা মলদ্বারের চারদিকে লেগে থাকে, পানিশূন্যতা, শুকিয়ে যাওয়া, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

গামবোরো রোগে আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- ক্ষুধামন্দা।
- পালক উসকোখুশকো হয়ে যায়।
- সাদা রঙের শ্লেষ্মাযুক্ত মল ত্যাগ করে, মলে রক্ত থাকতে পারে। এ মল মলদ্বারের চারপাশে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে।
- প্রথমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও পরে তা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে আসে।
- পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার কারণে পানিশূন্যতা দেখা দেয়।
- পাখি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- শরীরের সতেজতা নষ্ট হয়।
- তীব্র রোগে পাখির শরীরে কাঁপুনি হয় ও অবশেষে পাখি মারা যায়।

- বেঁচে যাওয়া পাখির দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
- ঊাচ্চাগুলো একসঙ্গে ব্রুডার বা ঘরের এককোণে জড়ো হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ ও প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে গামবোরো রোগ শণাক্ত করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- মৃত বাচ্চার ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। এতে–
  - থাইমাস এবং বার্সা ফুলে যায় ও তাতে রক্তের ছিটা পাওয়া যায়।
  - পা এবং উরুর মাংসে রক্তের বড় বড় ছিটা দেখা দেয়।

চিত্র ১০ ঃ গামবোরো রোগে আক্রান্ত বাচ্চা মুরগি

চিত্র ১১ ঃ সুস্থ পাখির বার্সা (বামে) ও গামবোরো রোগে আক্রান্ত পাখির ফোলা বার্সা (ডানে)

চিকিৎসা

আক্রান্ত পাখিগুলোকে ৩–৫ দিন স্যালাইন পানি পান করালে পানিশূন্যতা রোধ হয়।

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, আক্রান্ত পাখিগুলোকে ৩–৫ দিন স্যালাইন পানি (৫ লিটার পানি + ২৫০ গ্রাম আঁখের গুড় + ১০০ গ্রাম লবণ) পান করালে এদের পানিশূন্যতা রোধ হয়। এরা শরীরে শক্তি পায় এবং রক্তপড়া বন্ধ হতে পারে। তাছাড়া ৫০০ মি.গ্রা. অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রতি ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে পরপর ৩ দিন খাওয়ালে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ

গামবোরা রোগ প্রতিরোধের জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের টিকা পাওয়া যায়।

প্রতিরোধই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পন্থা। এজন্য খামারে সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। ঘরদোর, খাঁচা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক, যেমন– ফরমালিন (ফরমালিন ঃ পানি = ১ ঃ ৯), আয়োসান বা সুপারসেপ্ট দিয়ে ধৌত করতে হবে। এতে গামবোরোর জীবাণু মারা পড়বে। এদেশে গামবোরোর বেশ কয়েক ধরনের টিকা আমদানি করা হয়। যেমন– নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮ (Nobilis Gumboro D 78), ঠও বার্সা জি (VI Bursa G), বার ৭০৬ (Bur 706), গামবোরাল সিটি (Gumboral CT) ইত্যাদি। এগুলো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় নির্দিষ্ট বয়সে পাখিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, ১৪–১৮ দিন বয়সে প্রথমবার ও ২৪–২৮ দিন বয়সে বুস্টার হিসেবে চোখে ড্রপ বা মুখের মাধ্যমে পান করিয়ে এ টিকা প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অনুশীলন (Activity) ঃ *পোল্ট্রি খামারে গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খামারীকে আপনি কী পরামর্শ দেবেন?*

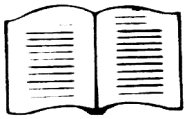

সারমর্ম ঃ গামবোরো বা ইনফেকশাস বার্সাইটিস বাচ্চা মুরগির একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে পাখির রোগপ্রতিরোধক অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ায় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই এ রোগকে পোল্ট্রি এইডস বলে। এ রোগে আক্রান্ত্রের হার অত্যন্ত বেশি (১০০%), কিন্তু মৃত্যু হার কম (৫–১৫%)। গামবোরো রোগে আক্রান্ত পাখিতে ক্ষুধামন্দা, পালক উসকোখুশকো হওয়া, সাদা ও আঠালো পাতলা পায়খানা হওয়া (যা মলদ্বারের চারদিকে লেগে থাকে), পানিশূন্যতা, শুকিয়ে যাওয়া, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। তীব্র অবস্থায় কাঁপুনি দিয়ে পাখি মারা যায়। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ ও ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, আক্রান্ত পাখিকে ৩–৫ দিন স্যালাইন পানি পান করালে পানিশূন্যতা রোধ হয়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের টিকা পাওয়া যায়। সাধারণত ১৪–১৮ দিন বয়সে প্রথমবার ও ২৪–২৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ হিসেবে টিকা প্রদান করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. গামবোরো রোগের ভাইরাস কোন্ পরিবারের অন্তভূর্ক্ত?

i) বিরনাভিরিডি
ii) পক্সভিরিডি
iii) প্যারামিক্সোভিরিডি
iv) রেট্রোভিরিডি

খ. কোন্‌টি গামবোরো রোগের টিকা?

i) গামবোরাল সিটি
ii) বার ৭০৬
iii) নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮
iv) উপরের সবগুলোই

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. গামবোরো রোগকে বার্ড এইডস বলে।
খ. গামবোরো আক্রান্ত পাখিকে স্যালাইন পান করানো নিষেধ।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. গামবোরো রোগ সর্বপ্রথম যুক্তরাস্ট্রের _____ অঙ্গরাজ্যে শণাক্ত করা হয়।
খ. গামাবোরো রোগাক্রান্ত পাখির বার্সা _____ যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পাখির রোগপ্রতিরোধক অঙ্গের নাম কী?
খ. গামবোরো রোগের টিকা কীভাবে প্রয়োগ করা হয়?

পাঠ ২.৪ মারেক'স রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মারেক'স রোগ কী ও এর কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- মারেক'স রোগ সংক্রমণ, রোগের লক্ষণ ও রোগ নির্ণয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোল্ট্রি খামারে মারেক'স রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মারেক'স পাখির স্নায়ুতন্ত্রের ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভাইরাসজনিত মারাত্তক সংক্রামক রোগ।

মারেক'স রোগ (Marek's Disease) পাখির স্নায়ুতন্ত্রের টিউমার সৃষ্টিকারী মারাত্তক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এটি লিম্ফোপ্রলিফারেটিভ রোগ (Lymphoproliferative Disবধংব) যা পাখির ক্যানসার। এ রোগে পাখির প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র, যৌন গ্রন্থি, চোখের আইরিস, পেশি ও ত্বক আক্রান্ত হয়। সাধারণত ৬–১০ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা মুরগি এবং বাচ্চা কোয়েল এ রোগে আক্রান্তদ হয়। ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম হাঙ্গেরিতে মারেক (Marek) নামে এক ব্যক্তি এ রোগটি আবিষ্কার করেন বলে তার নামানুসারে এ রোগের এরূপ নামকরণ করা হয়। অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে একে ফাউল প্যারালাইসিসও (Fowl Paralysis) বলে।

রোগের কারণ

হারপেসভিরিডি (Herpesviridae) পরিবারের অন্তর্গত হারপেস ভাইরাস ২ বা মারেক'স ডিজিজ ভাইরাস (MDV) নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ।

বাতাস, খাদ্যের ব্যাগ, আক্রান্ত পাখির লালা, শ্লেষ্মা, মল, পাখার ফলিকুল ইত্যাদির মাধ্যমে মারেক'স রোগ ছড়ায়।

রোগ সংক্রমণ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

- বাতাসের সাহায্যে জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে।
- খাদ্যের ব্যাগ বা বস্তা, যন্ত্রপাতি, জামা-জুতা ইত্যাদির মাধ্যমে।
- আক্রান্ত পাখির লালা, শ্লেষ্মা, মল, পাখার ফলিকুল বা গোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে।
- কীটপতঙ্গ, বিশেষ করে, ডার্কলিং বিটলের (Darkling Beetle) মাধ্যমে।

অবশতা মারেক'স রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাখির জাত, বয়স ও ভাইরাসের স্ট্রেইনের ওপর লক্ষণ নির্ভরশীল।

রোগের লক্ষণ

অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আক্রান্ত পাখির জাত, বয়স ও ভাইরাসের স্ট্রেইনের ওপর এ রোগের লক্ষণ নির্ভর করে। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

- প্রান্তীয় স্নায়ু আক্রান্তের ফলে এক পা, এক ডানা বা দুই পা, দুই ডানা অবশ হয়ে ঝুলে পড়ে।

চিত্র ১২ ঃ মারেক'স রোগে আক্রান্ত মুরগি

- ঘাড়ের মাংসপেশি আক্রান্ত হলে মাথা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে।
- আইরিস বা চোখের উপতারা আক্রান্ত হলে পাখিতে অন্ধত্ব দেখা দেয়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে–

- ক্ষুধামন্দা দেখা যায়।
- ফ্যাকাশে দেখায়।
- পাতলা পায়খানা হয়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- পাখি খোঁড়ায় ও পা, ডানা ইত্যাদি অবশ হয়ে যায়।
- হা করে নিঃশ্বাস নেয়।
- অনাহার ও পানিশূন্যতার কারণে পাখি মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ ও প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তনের মাধ্যমে মারেক'স রোগ নির্ণয় করা হয়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। যেমন–

  আক্রান্ত পাখির–

  - বার্সা ও থাইমাস ছোট হয়ে যাবে।
  - প্রান্তীয় স্নায়ু, যেমন– সায়াটিক স্নায়ু মোটা হবে।
  - যে কোনো অভ্যন্তরীণ অঙ্গে এবং পাখার ফলিফুল বা গোড়ায় টিউমার হবে।
  - চোখের আইরিসের বর্ণের বিকৃতি ঘটবে।

ক– সায়াটিক স্নায়ুতে টিউমার খ– ডিম্বাশয়ে টিউমার

চিত্র ১৩ (ক, খ) ঃ মারেক'স রোগে আক্রান্ত পাখির সায়াটিক স্নায়ু ও ডিম্বাশয়ে টিউমার

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

রোগ নিয়ন্ত্রণ ও রোগপ্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন–

মারেক'স রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

- স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থায় খামার পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন বয়সের মুরগি বা কোয়েল আলাদা আলাদা পালন করা।
- আক্রান্ত পাখি সুস্থ পাখি থেকে দূরে রাখা।
- খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- সুস্থ মুরগির বাচ্চার টিকা প্রদান করা।

মারেক'স রোগ প্রতিরোধের জন্য বাচ্চা মুরগিতে টিকা প্রয়োগ করা সর্বোত্তম পন্থা।

মারেক'স রোগ প্রতিরোধের জন্য বাচ্চা মুরগিতে টিকা প্রয়োগ করা সর্বোত্তম পন্থা। যে কোনো ধরনের সংহারী টিউমার বা ক্যানসারের বিরুদ্ধে এটি প্রথম উদ্ভাবিত টিকা। বাংলাদেশে মারেক'স রোগের টিকা প্রস্তুত হয় না। তবে, বাজারে আমদানি করা টিকা কিনতে পাওয়া যায়। মারেক'স রোগের বিভিন্ন ধরনের টিকা রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে এইচ.টি.ভি.–১২৬ (HTV–126) অর্থাৎ মারেক্সিন সি এ (Marexiue CA) ভালো কাজ করে। এ টিকা একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগিতে ০.২ মি.লি. মাত্রায় মাংসপেশি বা ত্বকের নিচে প্রয়োগ করা হয়।

অনুশীলন (Activity) *ঃ আপনার এলাকায় কোনো পোল্ট্রি খামারে মারেক'স রোগ হলে আপনি খামারীকে কী পরামর্শ দেবেন? যুক্তি সহকারে লিখুন।*

সারমর্ম ঃ মারেক'স রোগ পাখির স্নায়ুতন্ত্রের সংহারী টিউমার বা ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ । হারপেস ভাইরাস ২ পাখিতে এ রোগের কারণ। সাধারণত ৬–১০ সপ্তাহ বয়সের মুরগি এবং বাচ্চা কোয়েল এতে আক্রান্ত হয়। বাতাস, খাদ্যের বস্তা, যন্ত্রপাতি, পরিচর্যাকারীর জামা-জুতো, আক্রান্ত পাখির মল, শ্লেষ্মা, পাখার গোড়া, ডানা, ঘাড় ইত্যাদিতে অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া রোগের তীব্রতা, পাখির জাত, বয়স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন ও টিকা প্রদান এ রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

১। সঠিক উত্তরো পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. মারেক'স রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

i) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবশতা
ii) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবশতা
iii) মাংসপেশির অবশতা
iv) প্রজননতন্ত্রের অবশতা

খ. সাধারণত কত সপ্তাহ বয়সের মুরগি মারেক'স রোগে আক্রান্ত হয়?

i) ১–২ সপ্তাহ
ii) ২–৪ সপ্তাহ
iii) ৪–৬ সপ্তাহ
iv) ৬–১০ সপ্তাহ

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. মারেক'স রোগকে ফাউল প্যারালাইসিসও বলা হয়।
খ. মারেক'স রোগে মৃত পাখির বার্সা ও থাইমাস ফোলা থাকে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. মারেক'স রোগের টিকার নাম _____ ।
খ. _____ বিটলের মাধ্যমে মারেক'স রোগ ছড়াতে পারে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. মারেক'স রোগের ভাইরাসের নাম কী?
খ. মারেক'স রোগের টিকা কী পরিমাণে একটি মুরগিতে প্রয়োগ করা হয়?

পাঠ ২.৫ ডাক প্লেগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হাঁসের প্লেগ বা ডাক প্লেগ কী তা বলতে পারবেন।
- ডাক প্লেগের কারণ, সংক্রমণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডাক প্লেগ রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

হাঁসের প্লেগ তীব্র প্রকৃতির ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। যে কোনো বয়সের হাঁস, রাজহাঁস এতে আক্রান্ত হতে পারে।

হাঁসের প্লেগ বা ডাক প্লেগ (Duck Plague) একটি তীব্র প্রকৃতির ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে যে কোনো বয়সের গৃহপালিত বা বুনো হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগ মহামারি আকারেও দেখা দিতে পারে। উচ্চ মৃত্যু হার, আলোকাতঙ্ক, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা ও ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে ৫–১০০% মৃত্যু হার হতে পারে। এ রোগকে ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিসও (Duck Viral Enteritis) বলা হয়।

রোগের কারণ

হারপেসভিরিডি (Herpesviridae) পরিবারের অন্তর্গত ডাক হারপেস ভাইরাস ১, অ্যানাটিড হারপেস ভাইরাস ১ বা ডাক প্লেগ ভাইরাস নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ।

রোগ সংক্রমণ

রোগাক্রান্ত পাখির সংস্পর্শ, দুষিত খাদ্য, পানি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে ডাক প্লেগের সংক্রমণ ঘটে।

নিম্নলিখিতভাবে সুস্থ হাঁস বা রাজহাঁসে ডাক প্লেগ রোগ ছড়াতে পারে। যেমন–

- রোগাক্রান্ত পাখির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে।
- দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে।
- রুগ্ন পাখি বেচাকেনার মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে।
- কীটপতঙ্গের মাধমে।

রোগের লক্ষণ

আকস্মিক রোগাক্রামণ, অধিক মৃত্যু হার, আলোকাতঙ্ক, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা, নাকের শ্লেষ্মা, উসকোখুশকো পালক, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি ডাক প্লেগের লক্ষণ।

আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

- আকস্মিক রোগাক্রমণ, অধিক ও অপরিবর্তিত মৃত্যু হার।
- হঠাৎ ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হাঁসের মৃত্যু ঘটে।
- মৃত হাঁসের পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে থাকে।
- আলোকাতঙ্ক দেখা দেয়।
- ক্ষুধামন্দা থাকে।
- প্রচন্ড পিপাসা থাকে।
- নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
- পালক উসকোখুশকো হয় ও পাখা ঝুলে থাকে।
- চলাফেরায় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়।
- পাতলা পায়খানা হয় যা পাখির লেজের আশেপাশে লেগে থাকে।
- ঘাড়-মাথা বাঁকা করে উপরের দিকে চেয়ে থাকে। এটি ডাক প্লেগের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে ডাক প্লেগ রোগ নিরূপন করা হয়।

যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ময়না তদন্তে বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। ময়না তদন্তে নিম্নরূপ প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন–
  - ♦ দেহের বিভিন্ন গহ্বরে রক্ত জমে।
  - ♦ খাদ্যনালি, খাদ্য অন্ত, হৃৎপিন্ড, যকৃত, বৃক্ক, ডিম্বাশয়ের ফলিকুল, ক্লোয়েকা প্রভৃতিতে রক্তক্ষরণের চিহ্ন থাকে।
  - ♦ যকৃত ও হৃৎপিন্ডে নেক্রোটিক ফোকাই অর্থাৎ গুচ্ছ গুচ্ছ পচন অংশ দেখা যায়।

চিত্র ১৫ ঃ ডাক প্লেগ রোগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

রোগপ্রতিরোধ

স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন ও টিকা প্রদানের মাধ্যমে ডাক প্লেগ রোগপ্রতিরোধ করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যেমন–

- খামারে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- অসুস্থ হাঁস সুস্থ হাঁস থেকে পৃথক করে রাখতে হবে।
- খামারের ঘরদোর, যন্ত্রপাতি, রোগাক্রান্ত পাখির ঘর, লিটার ইত্যাদি জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকা প্রয়োগ সর্বোত্তম পন্থা।

বাংলাদেশে ডাক প্লেগ রোগের টিকা বা ডাক প্লেগ ভেক্সিন প্রস্তুত করা হয়। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ গবেষণাগারে উৎপাদিত এ টিকা নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিসস্রুত পানিতে গুলে প্রতিটি সুস্থ হাঁসের রানের মাংসে ১ মি.লি. পরিমাণে ইনজেকশন দিতে হবে। ৩০ দিন বয়সের হাঁসে প্রথমবার এবং ৪৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ দিতে হবে। এরপর ৬ মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *ডাক প্লেগ রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের (ভাইরাসের) নাম জানেন কি? সে কোন্ পাখিতে কী রোগ সৃষ্টি করে? ডাক প্লেগের সঙ্গে তার পার্থক্য নিরূপন করুন।*

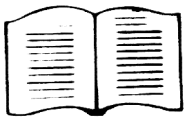

সারমর্ম ঃ ডাক প্লেগ হাঁস ও রাজহাঁসের একটি তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ। এ রোগে যে কোনো বয়সের গৃহপালিত ও বুনো হাঁস আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যু হার অত্যন্ত বেশি। ডাক হারপেস ভাইরাস ১ এ রোগের জন্য দায়ী। রোগাক্রান্ত পাখির সংস্পর্শে দুষিত খাদ্য ও পানি এবং কীটপতঙ্গের মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে। হঠাৎ মৃত্যু, পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে যাওয়া, আলোকাতঙ্ক, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা ও ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ ও প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন থেকে রোগ নির্ণয় করা হয়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদানই সর্বোত্তম পন্থা। ৩০ দিন বয়সে প্রথমবার এবং ৪৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ দিতে হয়। এরপর ছয়মাস পরপর টিকা দিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ডাক প্লেগ কোন্ ধরনের রোগ?

i) তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ
ii) ভাইরাসজনিত রোগ
iii) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ
iv) i ও ii উভয়ই

খ. ডাক প্লেগের অন্য নাম কী?

i) ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস
ii) ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিস
iii) উপরের দুটোই
iv) কোনোটিই নয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ডাক প্লেগে আক্রান্তের হার বেশি ও মৃত্যু হার কম।
খ. ডাক প্লেগ রোগের চিকিৎসা আছে।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ডাক প্লেগ রোগে মৃত হাঁসের _____ বেরিয়ে আসে।
খ. _____ রোগে আলোকাতঙ্ক দেখা দেয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ডাক প্লেগের ভাইরাসের নাম কী?
খ. ডাক প্লেগ রোগের টিকা কখন কখন দিতে হয়?

ব্যবহারিক

পাঠ ২.৬ ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে রাণীক্ষেতের লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে রাণীক্ষেত রোগ শণাক্ত করতে পারবেন।
- রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণগুলো খাতায় লিখতে ও বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্তক ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে গৃহপালিত পাখির রোগগুলোর মধ্যে মুরগির রাণীক্ষেত রোগ সবচেয়ে মারাত্তক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়। এটি এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগে মুরগির শ্বাসনালি, অন্তনালি ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে থাকে। পাঠ ২.১ এ রাণীক্ষেত রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ রোগে আক্রান্ত মুরগির ছবি এ পাঠ ছাড়াও পাঠ ২.১ এ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এ বইয়ে সংযোজিত রঙিন প্লেটে আক্রান্ত পাখির রঙিন ছবি (রঙিন চিত্র ১–৪) দেয়া হয়েছে। পাঠ ২.১ ভালোভাবে পড়ুন এবং ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

উপকরণ

১. রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত পাখির ছবি অথবা সম্ভব হলে একটি আক্রান্ত মুরগি।
২. ব্যবহারিক খাতা, পেন্সিল, কলম, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে রোগাক্রান্ত পাখি বা পাখির ছবি আপনার সামনে নিয়ে আসুন।
- আক্রান্ত পাখির বয়স জেনে নিন বা অনুমান করুন।
- ছবি না হয়ে সত্যিকারের পাখি হলে এর পরিচর্যাকারী বা মালিকের কাছ থেকে রোগ হওয়ার ইতিহাস জেনে নিন।
- এবার আক্রান্ত পাখি বা ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন ও এর শারীরিক অবস্থা বা দৈহিক পরিবর্তনগুলো নোট করুন।

ক– আক্রান্ত মুরগি খ– আক্রান্ত মুরগির ডিম

চিত্র ১৬ (ক, খ) ঃ রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগি ও মুরগির ডিম

- আপনার দেখা পরিবর্তনগুলোর সাথে পাঠ ২.১ এ পড়া রাণীক্ষেতের রোগলক্ষণগুলো মিলিয়ে নিন।
- এবার এ লক্ষণগুলো থেকে রাণীক্ষেত রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।
- প্রয়োজনে আপনার কোনো সহপাঠির সঙ্গে আলোচনা করে রোগলক্ষণ শণাক্ত করুন।
- এবার পুরো পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া ও রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন। প্রয়োজনে ছবি আঁকুন।
- ব্যবহারিক খাতা টিউটরকে দেখান ও সই নিন।

চিত্র ১৭ ঃ রাণীক্ষেত রোগে মুরগির ঘাড় বেঁকে যায়

সাবধানতা

- আক্রান্ত পাখি বা ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন।

ব্যবহারিক

পাঠ ২.৭ ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে বসন্তের লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে বসন্ত রোগ শণাক্ত করতে পারবেন।
- উসন্ত রোগের লক্ষণগুলো খাতায় লিখতে ও বলতে পারবেন।

বসন্ত ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স ও প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পাখির বসন্ত বা ফাউল পক্স একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স এবং প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে পাখির দেহের পালকহীন স্থানে এবং মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি ও অন্ত্রে বসন্তের গুটি দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত পাখিতে ৫০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে। বসন্ত রোগ সম্পর্কে পাঠ ২.২ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ রোগে আক্রান্ত মুরগির ছবি এ পাঠ ছাড়াও পাঠ ২.২ এ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এ বইয়ে সংযোজিত রঙিন প্লেটে আক্রান্ত পাখির রঙিন ছবি (রঙিন চিত্র ৫–৬) দেয়া হয়েছে। পাঠ ২.২ ভালোভাবে পড়ুন এবং ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

উপকরণ

১. বসন্ত রোগে আক্রান্ত মুরগির ছবি বা সম্ভব হলে একটি রোগাক্রান্ত মুরগি।
২. ব্যবহারিক খাতা, পেন্সিল, কলম, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে রোগাক্রান্ত মুরগির ছবি বা মুরগি আপনার সামনে নিয়ে আসুন।
- আক্রান্ত পাখির বয়স জেনে নিন বা অনুমান করুন।
- ছবি না হয়ে বসন্তে আক্রান্ত পাখি হলে এর মালিক বা পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে রোগ হওয়ার ইতিহাস জেনে নিন।
- এবার আক্রান্ত পাখি বা ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন ও পাখির শারীরিক অবস্থা বা দৈহিক পরিবর্তনগুলো নোট করুন।

চিত্র ১৮ ঃ ত্বকীয় প্রকৃতিতে মুরগির মুখে বসন্তের গুটি

- আপনার দেখা পরিবর্তনগুলোর সাথে পাঠ ২.২ এ বর্ণিত রোগলক্ষণগুলো মিলিয়ে নিন।
- প্রয়োজনে আপনার কোনো সহপাঠির সঙ্গে আলোচনা করে রোগলক্ষণ শণাক্ত করুন।
- এবার এ লক্ষণগুলো থেকে বসন্ত রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।
- পুরো পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া ও বসন্ত রোগের লক্ষণগুলো ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিখুন। প্রয়োজনে ছবি আঁকুন।
- ব্যবহারিক খাতাটি টিউটরকে দেখান ও তাতে সই নিন।

চিত্র ১৯ ঃ ডিপথেরিটিক প্রকৃতিতে মুরগির মুখগহ্বরে বসন্তের ক্ষত

সাবধানতা

- আক্রান্ত পাখি বা ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভাইরাস কী? পোল্ট্রির পাঁচটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম লিখুন।
২। রাণীক্ষেত রোগের কারণ ও লক্ষণ লিখুন।
৩। কীভাবে রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধ করবেন?
৪। বসন্ত কয় প্রকৃতির? নামসহ বর্ণনা করুন।
৫। কীভাবে বসন্ত রোগ নির্ণয় করবেন? এর চিকিৎসা আছে কী?
৬। পোল্ট্রি এইডস কী? এ রোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৭। গামবোরো রোগের কারণ ও সংক্রমণ পদ্ধতি লিখুন।
৮। কোন্ রোগকে পোল্ট্রির ক্যানসার বলে? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৯। বাংলাদেশে হাঁসের প্রধান ভাইরাসজনিত রোগ কোন্‌টি? কীভাবে এ রোগ নির্ণয় করবেন।
১০। মারেক'স ও ডাক প্লেগ রোগের মধ্যকার মিল ও অমিল খুঁজে বের করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ২

পাঠ ২.১

১। ক. ii ১। খ. i ২। ক. মি ২। খ. স ৩। ক. নিউমো-এনসেফালাইটিস ৩। খ. সাদাটে
৪। ক. ভেলোজেনিক, মেসোজেনিক ও লেন্টোজেনিক ৪। খ. বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি.

পাঠ ২.২

১। ক. iii ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. বাইফর্কড ৩। খ. এক মাসের
৪। ক. ত্বকীয়, হেড বা শুষ্ক প্রকৃতির এবং ডিপথেরিটিক বা আর্দ্র প্রকৃতির ৪। খ. পিজিয়ন পক্স টিকা ও ফাউল পক্স টিকা

পাঠ ২.৩

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। ক. মি ৩। ক. দেলওয়ার ৩। খ. ফুলে
৪। ক. বার্সা অভ্ ফ্যাব্রিসিয়াস ৪। খ. চোখে ড্রপ হিসেবে বা মুখ দিয়ে পান করানোর মাধ্যমে

পাঠ ২.৪

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. HTV–১২৬ ৩। খ. ডার্কলিং
৪। ক. হারপেস ভাইরাস ২ বা মারেক'স ডিজিজ ভাইরাস ৪। খ. ০.২ মি.লি. মাত্রায়

পাঠ ২.৫

১। ক. iv ১। খ. ii ২। ক. মি ২। খ. মি ৩। ক. পুরুষাঙ্গ ৩। খ. ডাক প্লেগ
৪। ক. ডাক হারপেস ভাইরাস ১, অ্যানাটিড হারপেস ভাইরাস ১ বা ডাক প্লেগ ভাইরাস
৪। খ. ৩০ দিন, ৪৫ দিন ও ৬ মাস পরপর